

- ☑ পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি
- ☑ পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকদানসমূহ
- ☑ কূটনৈতিকদের কার্যাবলি
- ☑ অর্থনৈতিক কূটনীতি

- ☑ জলবায়ু পরিবর্তন ও জাতীয় নিরাপত্তা
- ☑ বৈশ্বিক উষ্ণায়ন
- ☑ জলবায়ু অভিযোজন
- ☑ জলবায়ু কূটনীতি

Written Syllabus on International Affairs

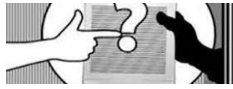
Section A: Conceptual Issues

- ☑ **Foreign policy and Diplomacy:** concepts of foreign policy and diplomacy, decision-making process, determinants of foreign policy, diplomatic functions, immunities, and privileges
- ☑ **Global Environment:** Environmental issues challenges, climate change, global warming, climate adaptation, climate diplomacy

BCS প্রশ্নাবলী

পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও জাতীয় নিরাপত্তা

- ⇒ জলবায়ু শরণার্থী (climate refugee) বলতে কী বোঝায়? (৪০তম বিসিএস)
- ⇒ পররাষ্ট্রনীতিতে জনকূটনীতির গুরুত্ব কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। (৪০তম বিসিএস)
- ⇒ অর্থনৈতিক কূটনীতি কী? (৪০তম বিসিএস)
- ⇒ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব আলোচনা করুন। (৪০তম বিসিএস)
- ⇒ অর্থনৈতিক কূটনীতি শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশ কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? (৪০তম বিসিএস)
- ⇒ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সর্বাধিক পছন্দসই দেশ (Most Favoured Nation) বলতে কি বুঝায়? (৩৮তম বিসিএস)
- ⇒ পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নের বহিঃ উপদানগুলি কি? (৩৭তম বিসিএস)
- ⇒ কপ-২২ (COP-22) মূল সিদ্ধান্তগুলি কী কী? (৩৭তম বিসিএস)
- ⇒ পররাষ্ট্রনীতির অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলো কি কি? (৩৫তম বিসিএস)
- ⇒ এগামবাসোডর ও হাইকমিশনার (টাকা) (৩৪তম বিসিএস)
- ⇒ অর্থনৈতিক কূটনীতি বলতে আমরা কী বুঝি? বাংলাদেশে এ প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী ও অর্থবহ করার জন্য কী কী উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন? (৩১তম বিসিএস)
- ⇒ “স্বার্থ সংরক্ষণ” কূটনীতিকের একটি অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে কি কি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে লিখুন। (২৯তম বিসিএস)
- ⇒ অর্থনৈতিক কূটনীতি কী? নয়া বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কূটনীতি কেন গুরুত্ব পেয়েছে? আলোচনা করুন। (২৭তম বিসিএস)
- ⇒ “এই বিশ্বায়নের যুগে একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্যসমূহ তাৎপর্যপূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়েছে”- আপনি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? আপনার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দিন। (২৫তম বিসিএস)
- ⇒ অর্থনৈতিক কূটনীতির সংজ্ঞা দিন। বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার কারণসমূহ বিশ্লেষণ করুন। (২৪তম বিসিএস)



যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

১. পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি বলতে কী বোঝায়?
২. পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
৩. ভিয়েনা কনভেনশন, ১৯৬১ অনুযায়ী কূটনীতিকের কার্যাবলি বলতে কী বোঝায়?
৪. কূটনৈতিক অধিকার, দায়মুক্তি ও সুযোগ সুবিধাগুলো কী কী?
৫. আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে অবাধিগত বা অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি (Persona non grata) বলতে কী বোঝায়?
৬. অর্থনৈতিক কূটনীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে
৭. নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব
৮. ট্রানজিট (Transit) ও ট্রানশিপমেন্ট (Transshipment) বলতে কী বোঝায়?
৯. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রেক্ষিতে বিশ্ব জলবায়ুর কি ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে?
১০. জলবায়ু কূটনীতির মূল বিষয়বস্তু কী?



Concepts of Foreign Policy and Diplomacy, Decision-Making Process, Determinants of Foreign Policy

পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতি

একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বলতে ঐ সমস্ত নীতিমালাকে বুঝায় যার মাধ্যমে সে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পরিবেশের মোকাবেলায় তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে; আর পররাষ্ট্রনীতির পরিচালনা পদ্ধতি/কৌশল হল কূটনীতি। Sir Harold Nicolson তাঁর The Congress of Vienna এ পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির সম্পর্কে বলেন- “Foreign policy is based upon a general conception of national requirements ... Diplomacy, on the other hand, is not an end but a means; not a purpose but a method..... It is the agency through which foreign policy seeks to attain its purpose by agreement rather than by war”। Organski-এর মতে কূটনীতি হলো- “One part of the process by which foreign policy is formulated and executed”।

কূটনীতি : কূটনীতি হলো “The application of intelligence and tact to the conduct of official relations between governments of independent state” (Guide to Diplomatic Practice, 1922 Sir Ernest Satow)। মূলত কূটনীতি হলো-

- ⇒ স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের সরকারের মধ্যে সরকারি পর্যায়ে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ;
- ⇒ উচ্চ নিম্ন সর্বস্তরের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ এবং তার প্রয়োগ;
- ⇒ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে পেশাদার ও অভিজ্ঞ কর্মচারী দ্বারা বৈদেশিক নীতির প্রয়োগ; এবং
- ⇒ এটা এমন এক কৌশল বা দক্ষতা যা আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সুসামঞ্জস্য ধারায় বিকাশ লাভ করতে সহায়তা করে।

Foreign Policy

‘পররাষ্ট্র’ হলো অন্য রাষ্ট্র এবং ‘নীতি’ হল বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রণীত কার্যাবলি। সাধারণভাবে পররাষ্ট্রনীতি হলো একটি রাষ্ট্রের অন্য রাষ্ট্রের সাথে জাতীয় স্বার্থ বিবেচনায় বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে গৃহীত নীতিমালা। পররাষ্ট্রনীতি জাতীয় স্বার্থের সেই অংশ যা বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন, সর্বোপরি বিশ্বব্যবস্থায় সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টির জন্য পররাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রীয় নীতিরই অনিবার্য অনুষঙ্গ। পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ নানা মত প্রদান করেছেন-

- মার্শালের মতে, রাষ্ট্র যে সকল ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করেছে বা করতে চাচ্ছে, তাদের সমষ্টিকে পররাষ্ট্রনীতি বোঝায়।
- জোসেফ ফ্রাঙ্কের মতে, পররাষ্ট্রনীতি বলতে সেই ধরনের সিদ্ধান্ত বা ক্রিয়াকলাপের সমষ্টিকে বোঝায় যার মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত।
- রাসেল এবং স্টার এর মতে, রাষ্ট্র তার সীমানার বাইরে অন্য রাষ্ট্রের জনগণ, কর্ম ও স্থানের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় যে গাইডলাইন প্রদান করে তাই পররাষ্ট্রনীতি।

উপরোক্ত মতামতসমূহের আলোকে আমরা একথা বলতে পারি, পররাষ্ট্রনীতি একটি রাষ্ট্রের গৃহীত সে সব বিধি ও কৌশল যা দেশটির জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে এবং নিজ দেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল রাখার লক্ষ্যে প্রণীত হয়। রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় যে সকল নীতি অনুসরণ করে বা করতে চায় সেগুলোই সেই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে পরিগণিত।

Decision –marketing process

১ পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া

বিশেষিত তথ্য এবং বিভিন্ন বিকল্পের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া ও ফলাফলে ভিত্তিতেই বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পররাষ্ট্র বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো এক ধরনের নয়। বাস্তবে প্রতিটি রাষ্ট্রেরই বর্তমানে পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নে যৌথ উদ্যোগ এবং প্রয়াস প্রয়োজন। রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়াও পররাষ্ট্র সচিব বা মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র দপ্তরের আমলা, গোয়েন্দা দপ্তরের অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, সেনাবাহিনীর প্রধান, প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন।

পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নের কাঠামো এবং প্রক্রিয়ার বিষয়ে আলোচনা ব্যতীত পররাষ্ট্র প্রভৃতির উপর প্রক্রিয়া অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

- সরকারি কাঠামোর বিভিন্নতা, কোন রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য প্রভৃতির উপর তার সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাঠামো নির্ভরশীল।
- চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কার হাতে ন্যস্ত থাকবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা যৌথ হবে কিনা ইত্যাদি বিষয়সমূহ মূলত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি এবং সরকারি কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি ছিল যৌথ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়। এককভাবে কোন পদাধিকারীকে এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় নি। আবার মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রে সাংবিধানিক দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির।

পররাষ্ট্র নীতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠে না। প্রত্যেক রাষ্ট্রই পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়নের নির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকে। কিন্তু কোন রাষ্ট্রই নিজের খেয়াল খুশি অনুযায়ী পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন বা বিদ্যমান পররাষ্ট্র নীতি সংশোধন বা বর্জন করে না। কোন রাষ্ট্রই বিচ্ছিন্নভাবে নিজের অস্তিত্ব রাখতে পারে না। সকল রাষ্ট্রই পারস্পারিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারা আবদ্ধ। এই কারণে প্রতিটি রাষ্ট্রকেই অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। রাষ্ট্রসমূহের পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে। পররাষ্ট্র নীতি হল অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতি কোন রাষ্ট্রের আচরণের ধরন। প্রত্যেক রাষ্ট্র নিজের স্বার্থে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে তার আচরণের ধরন স্থির করে। তবে কোন রাষ্ট্রই আকস্মিকভাবে পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। প্রয়োজন অনুসারে রাষ্ট্র তার নীতি স্থির করে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রই একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশের মধ্যে নিজের কার্যাবলি সম্পাদন করে। সুতরাং আন্তর্জাতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তঃরাষ্ট্রীয় আচরণ স্থির করে। সুতরাং আন্তর্জাতিক পরিবেশের চাপ ও দাবি পররাষ্ট্র নীতির উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে।

এই কারণেই পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে প্রত্যেক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বা আন্তর্জাতিক পরিবেশের দাবি এবং চাপের প্রভাব বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির উল্লেখ করা যায়। জোট বা গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা ভারতের পররাষ্ট্র নীতির প্রধান ভিত্তি। কিন্তু জোট-নিরপেক্ষতার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভিত্তি আছে। স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য উন্নত রাষ্ট্র সমূহের সাহায্য প্রয়োজন। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুনিশ্চিতকরণের জন্য শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রয়োজন। গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা আন্তর্জাতিক বিরোধ ও সংঘর্ষ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত রেখে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিস্থিতি সুনিশ্চিত করতে পারে।

Determinants of Foreign Policy

১ পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক / উপাদানসমূহ

প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন করে। পররাষ্ট্র নীতির উপাদানগুলো দু'ধরনের হতে পারে।

ক. পররাষ্ট্রনীতির স্থির উপাদান।

খ. পররাষ্ট্রনীতির অস্থির বা চলক উপাদান।

ক) পররাষ্ট্রনীতির স্থির উপাদান হল

১. ভৌগলিক অবস্থান : আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ তার পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম উপাদান বা নির্ধারক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কোন রাষ্ট্রের আয়তন, ভূ-প্রকৃতি এবং জলবায়ু তার পররাষ্ট্র নীতিকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। এসব স্থায়ী উপাদানগুলোর উপর একটা রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারিত হয়।
২. সামাজিক ঐতিহ্য : সামাজিক ঐতিহ্যকেও বৈদেশিক নীতির উপাদান বা নির্ধারক হিসেবে গণ্য করা হয়। একটা রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে সে রাষ্ট্রের সামাজিক ঐতিহ্য বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়।

৩. **অতীত ইতিহাস:** সামাজিক ঐতিহ্যের ন্যায় অতীত ইতিহাসও পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারক হিসেবে বিবেচিত হয়। অতীত ইতিহাস আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।
৪. **ভাষা :** পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে ভাষাও অন্যতম নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। ভাষাকে সাধারণত পররাষ্ট্র নীতির স্থায়ী উপাদান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন- কোন রাষ্ট্রে ভাষাগত ঐক্য বিরাজমান থাকলে রাষ্ট্রে শক্তিশালী নীতি গড়ে উঠে।
৫. **জনসংখ্যা :** পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে যে উপাদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল জনসংখ্যা। সাধারণত শিক্ষিত ও সচেতন জনগোষ্ঠী একটা রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে। দক্ষ জনশক্তি জাতীয় শক্তিকে দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলে। আর জাতীয় শক্তি দৃঢ় ও মজবুত হলে পররাষ্ট্র নীতি একটি দেশের অনুকূলে প্রবাহিত হয়।
৬. **সামরিক শক্তি :** আধুনিক উদারনৈতিক গনতান্ত্রিক যুগে সামরিক শক্তি জাতীয় শক্তিকে শক্তিশালী করতে বলিষ্ঠভাবে সাহায্য করে। আর রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সে দেশের পররাষ্ট্র নীতির সহায়ক শক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন হয়। তাই আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থায় যে রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি বেশি, সে রাষ্ট্রের নীতি অত্যন্ত ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এবং উন্নত বিশ্বের কাছে সে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠে।
- খ. **অস্থির বা চলক উপাদান :** রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে যেসব অস্থির চলক উপাদান কাজ করে, তা নিম্ন আলোচনা করা হলো
১. **অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** যে কোন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত অর্থনৈতিক সম্পদ। অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাত্রার উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে অন্য রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী হতে হয়। দেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তিতে অন্য রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক নির্ধারিত হয়ে থাকে।
 ২. **সরকারের আদর্শ :** একটা রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে সরকারের নৈতিক মতাদর্শ প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। সরকারের মতামত যে দিকে প্রবাহিত হয়, সে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি সেভাবে গড়ে উঠে। উদাহরণস্বরূপ, স্বাধীনতা উত্তর কালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি মার্কিন ঘেঁষা ছিল, কারণ সরকারের নৈতিক আদর্শ ছিল সেরূপ।
 ৩. **পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় :** একটা রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর দায়িত্ব থাকে সে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ করার। কোন রাষ্ট্রের মন্ত্রণালয় শক্তিশালী হলে, সে রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিও শক্তিশালী হিসেবে গড়ে উঠে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পৃথিবীর একক পরাশক্তির অন্যতম মূখ্য দায়িত্ব পালন করে, যা দেশের পররাষ্ট্র নীতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে।
 ৪. **অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশ :** একটা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির উপর সে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ হয়ে থাকে। দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিবেশ যদি স্থিতিশীল থাকে, তবে পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে অন্য রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না।
 ৫. **আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা :** বর্তমানে আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমলাতন্ত্র পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। দেশের আমলা শ্রেণি পরোক্ষভাবে দেশের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে সরকারকে ইন্ধন যোগায়, যা রাষ্ট্রকে অনেক সময় স্বীকার করে নিতে হয়।
 ৬. **আইনসভা :** আইন সভা হলো রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর। একটা রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সাধারণত আইন সভার উপর নির্ভর করে। তাই আইনসভা কার্যকর থাকলে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি শক্তিশালী হয়, যেমন- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে সিনেট কার্যকর ভূমিকা রাখে।
 ৭. **বিশ্বের পরিস্থিতি :** বিশ্ব পরিস্থিতি একটা রাষ্ট্রের সার্বিক পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। বিশ্ব পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি প্রণীত হয়। বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকলে পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণ সহায়ক হয়।
 ৮. **জাতীয় স্বার্থ ও মূল্যবোধ :** একটা রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির মধ্যে তার জাতীয় স্বার্থ ও মূল্যবোধ চরিতার্থ হয়ে উঠে। কোন রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ ও মূল্যবোধকে উপেক্ষা করে সে রাষ্ট্র পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন করতে পারে না।
 ৯. **রাজনৈতিক দল :** একটা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল সে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে অনন্য ভূমিকা রাখে। রাজনৈতিক দলগুলো সে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিতে তাদের নৈতিক আদর্শকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।
 ১০. **চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী :** রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন অনুরূপ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সামঞ্জস্য রক্ষা করে বৈদেশিক নীতি প্রণীত হয়।
 ১১. **মতাদর্শ :** বৈদেশিক নীতির অন্যতম নির্ধারক হিসেবে মতাদর্শ ভূমিকা রাখে। যেমন- পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ভিন্ন মতাদর্শের আলোকে পররাষ্ট্র নীতি গড়ে উঠে।



Diplomatic Functions

কূটনীতি

"Diplomacy" বা কূটনীতি শব্দটি গ্রীক ভাষা হতে উদ্ভূত যার অর্থ হচ্ছে আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা। তাই কূটনৈতিক প্রতিনিধি বলতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণকে বুঝায়। প্রাচীন কাল হতেই কূটনৈতিক প্রতিনিধির প্রচলন চলে আসছে। Diplomacy is the management of Relation between nation by the representation in abroad. It is an art of preserving good international relations. পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার্থে দুটো রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ প্রতিনিধি মারফত যে সম্পর্ক রক্ষা করা বা আলোচনা হয়, তাকেই বলা হয় কূটনীতি। এ ধরনের কার্যের সাথে যারা সম্পর্কিত থাকেন তাদেরকে বলা হয় কূটনৈতিক। এছাড়া কোনো দেশের সরকার আপন দেশের স্বার্থে অন্য দেশের সরকারের সঙ্গে যে সব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও অন্যান্য তৎপরতা চালায়, সেগুলোও কূটনীতির অন্তর্ভুক্ত। জোট গঠন ও জোটের স্বার্থে পরিচালিত তৎপরতাও কূটনীতির আওতাভুক্ত।

যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয় সেই প্রক্রিয়াকে কূটনৈতিক বলা হয়। কূটনৈতিক হচ্ছে স্বাধীন রাষ্ট্র সমূহের সরকারের মধ্যে সরকারী পর্যায়ে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ। কূটনৈতিক হচ্ছে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পরিচালনা। ১৮১৫ সালের ভিয়েনা কংগ্রেস এবং ১৮১৮ সালের সম্মেলনে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের নিম্নোক্ত তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে- ১. রাষ্ট্রদূত (Ambassador) বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী বা দূত, ২. আবাসিক দূত এবং ৩. চার্জ দ্য এফেয়ার্স।

কূটনৈতিক স্টাফ: কূটনৈতিক প্রধানের অধীনে বেশ কিছু সংখ্যক স্টাফ থাকেন যদিও অধিকাংশই প্রেরনকারী দেশের নাগরিক। মিশনে দুই ধরনের স্টাফ দেখা যায়-

১) **কূটনৈতিক স্টাফ:** মিশন প্রধান ছাড়া কাউন্সেলর, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেক্রেটারী এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরি যথা, সামরিক, রাজনৈতিক ইত্যাদিও এ্যাটাচে কূটনৈতিক স্টাফ।

২) **অকূটনৈতিক স্টাফ:** প্রশাসনিক, কারিগরি ও সেবক কর্মচারীগণ অকূটনৈতিক।

কূটনৈতিক স্টাফের সকলেই এবং অকূটনৈতিক স্টাফের অধিকাংশ নিজ দেশের নাগরিক। তবুও তুলনামূলকভাবে কূটনৈতিক স্টাফ বেশী সুযোগসুবিধা ভোগ করে। কতিপয় কর্মচারী যেমন, অভ্যর্থনাকারী, অনুবাদক, গাড়ীচালক, গার্ড ইত্যাদি গ্রাহক দেশের নাগরিকদের মধ্য হতে নিয়োগ করা হয় এবং তাদেরকে স্থানীয় স্টাফ বলে। যদিও তারা একই মিশনের স্টাফ তবুও কূটনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয় না এবং কোনরূপ সুযোগ সুবিধা ভোগ করে না।

কূটনীতিকদের কার্যাবলি

ভিয়েনা কনভেনশন, ১৯৬১ অনুযায়ী একজন কূটনীতিকের কার্যাবলি হলো প্রতিনিধিত্ব করা, স্বার্থরক্ষা, আলাপ-আলোচনা, তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য প্রেরণ, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত সম্পর্কের উন্নয়ন। নিম্ন এসকল কার্যাবলি বিশ্লেষণ করা হলো:

১. **প্রতিনিধিত্ব :** একজন কূটনীতিক বিদেশে নিযুক্ত নিজ দেশের বৈধ প্রতিনিধি। তিনি লিয়াজো অফিসারের মত দায়িত্ব পালন করেন। তিনি যে দেশে নিযুক্ত থাকেন সে দেশের মানুষের নিকট নিজ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যাবলি তুলে ধরেন। তাছাড়া বৈদেশিক দূতাবাসে নিযুক্ত কর্মচারী, অন্যান্য কূটনীতিবিদ এবং ঐ দেশের বৈদেশিক সাহায্য সংস্থাগুলোর সাথে সুসম্পর্কের মাধ্যমে নিজস্ব রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যগুলোকে বাস্তবে রূপদান করেন। একজন কূটনীতিককে ভাল ব্যাখ্যাদাতা হতে হবে এবং তাকে কর্মরত দেশ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। এ ছাড়া শোকবার্তা প্রেরণ, অভিনন্দন প্রেরণ ইত্যাদি কূটনীতিবিদদের মাধ্যমেই পাঠাতে হয়। বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ও জাতীয় ইত্যাদি বিষয়াদিতে তিনি নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

২. **আলাপ-আলোচনা :** কূটনীতিবিদদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া বা মীমাংসা করা। তিনি এমন আলাপ-আলোচনা চালাবেন যাতে কোনক্রমেই জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না হয়। তাকে এ দায়িত্বের সাথে দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক খসড়া চুক্তির রচনা ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করতে হয়।
৩. **তথ্য প্রেরণ :** কূটনীতিকদের অন্যতম কাজ হলো সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সংক্রান্ত সংবাদ প্রেরণ করা। এছাড়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে নীতি প্রণয়ন করে তার তথ্য ও সংবাদ সরবরাহ করে একজন কূটনীতিক। এজন্য কূটনীতিকদের প্রথম শ্রেণির প্রতিবেদক বলা হয়। তিনি শুধু সংবাদ পাঠিয়ে দায়িত্ব শেষ করেন না বরং তার সাথে সংশ্লিষ্ট মতামতও প্রেরণ করেন। কূটনীতিক প্রতিবেদন শুধু পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ নয় বরং অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও এটা সক্রিয় এবং তাৎপর্যবহু ভূমিকা রাখে।
৪. **বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা :** কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের প্রধান দায়িত্ব হলো প্রেরণকারী রাষ্ট্রের সাথে অবস্থানকারী রাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য সদা সচেষ্ট থাকা। একটি রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্ট্রের বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপনের ফলেই উন্মুক্ত হয় পারস্পারিক সাহায্য ও সহযোগিতার দ্বার। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ফলে এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সংকটে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে। একজন কূটনীতিকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো তার নিজের ও নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজ দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।
৫. **কার্যসূচি পরিচালনা :** বর্তমানে কূটনীতিকদের আর একটি কাজ হলো কার্যসূচি পরিচালনা। বহুজাতিক সংস্থা ও সরকারি সংগঠন বিদেশে নানারকম অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মের মধ্যে লিগু থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধিতে সাহায্য পরিচালনা করা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সমস্ত সংস্থার কাজও বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই কূটনীতিক মিশন এ সমস্ত কাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।
৬. **সংস্কৃতির ব্যাখ্যা :** কূটনীতিবিদগণের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো বিভিন্ন রকম সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করা। পেশার খাতিরে কূটনীতিবিদকে নানা প্রকার সংস্কৃতির মুখোমুখি হতে হয়। এ সমস্ত সংস্কৃতি পরস্পর বিরোধীও হতে পারে। যাই হোক কূটনীতিবিদকে দক্ষভাবে সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করতে হয়।
৭. **নিজ দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ :** একজন কূটনীতিকের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে তার নিজ দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। এ মানসিকতা অনেক সময় স্বার্থপরতার নামান্তর হতে পারে। তবুও প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে একজন কূটনীতিকের মূল লক্ষ্য। অনেক সময় তাকে বিদেশে বসবাসকারী অথবা ভ্রমণকারী নাগরিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষানবিশ এবং সাধারণ নাগরিকগণকে সাহায্য করা প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিদেশে নিজ দেশের স্বার্থবিরোধী তৎপরতাকে প্রতিহত করাও একজন দায়িত্বশীল কূটনীতিকের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
৮. **পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়ন করা :** বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র তার নিজের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রয়োজন বিবেচনা সাপেক্ষে জাতীয় শক্তি ও আন্তর্জাতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে। সেসব গৃহীত নীতিমালাকে ফলপ্রসূ করার জন্যই কূটনীতির আশ্রয়গ্রহণ করা হয়। কূটনীতি হলো বৈদেশিক নীতি বা পররাষ্ট্রনীতিকে সফল করে তোলার একটি প্রধান উপায়।
৯. **সমস্যা মীমাংসা ও নীতি বাস্তবায়ন করা :** প্রতিটি রাষ্ট্রকেই অন্য রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, দ্বি-পাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সমস্যার মীমাংসা, জাতীয় স্বার্থের অবক্ষয় রোধ বা অন্য কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি অনুসরণ করতে হয়। কিন্তু নীতি নির্ধারণই চূড়ান্ত বিষয় নয়, এসব নীতিসমূহ কার্যকর করা আরো বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এজন্যই আধুনিককালে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে নীতি নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন উভয়কেই সমান গুরুত্ব অনুসারে বিবেচনা করা হয়। কাজেই জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় ও জাতীয় নীতিসমূহ বাস্তবায়নে একজন কূটনীতিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
১০. **যোগাযোগ রক্ষাকারী :** কূটনীতিকগণ যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। নিজ দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নানা প্রকার সমস্যাবলি নিয়ে কূটনীতিকগণ নিয়োগপ্রাপ্ত দেশের সাথে আলোচনা করেন এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন চুক্তির খসড়াও প্রস্তুত করেন।
১১. **চুক্তি সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা :** কূটনীতিগণ কেবল রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতীকী প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন না, তিনি বৈধ প্রতিনিধিত্বের কাজও করে থাকেন। কূটনীতিবিদের স্বাক্ষর রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানের স্বাক্ষর বলে বিবেচিত হয়। তিনি যাবতীয় সভা-সমিতিতে যোগদান করেন এবং সর্বত্র বৈধ প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেন। কূটনীতিবিদগণ যখন তার রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করেন, তখন তিনি রাষ্ট্রের মতামত ব্যক্ত করেন- সেখানে তার নিজের মতামত প্রকাশ করা হয় না।

১২. নিজ দেশের নাগরিক স্বার্থ রক্ষা : রাষ্ট্রদূত যে দেশে নিয়োগ লাভ করেন, সে দেশের বসবাসরত নিজ দেশের নাগরিকদের সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর এবং তত্ত্বাবধান করাও রাষ্ট্রদূতের অন্যতম প্রধান কাজ। নিজ দেশের নাগরিকগণ যাতে অন্য রাষ্ট্রে তাদের চাকরি, ব্যবসা বা অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রকার অন্যায, অবিচার বা সমস্যার সম্মুখীন না হয়, সে বিষয়েও রাষ্ট্রদূতকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। তাছাড়া এসব নাগরিকগণ কোনো অসামাজিক বা অপরাধমূলক কাজ করে বিদেশে নিজ দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে কিনা, সেদিকেও রাষ্ট্রদূতগণ প্রভূত সতর্কতা অবলম্বন করেন।
১৩. তথ্য সংগ্রহের কাজ করা : প্রকৃত অর্থে বিদেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতগণকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করতে হয়। রাষ্ট্রদূত যে দেশে কর্তব্যরত থাকেন, তাকে সে দেশের পররাষ্ট্রনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত নীতি, সামরিক নীতি এবং সামরিক বিষয়ে সে রাষ্ট্রের প্রস্তুতি, জনমত, রাজনৈতিক দলসমূহের মনোভাব প্রভৃতি সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্ক সঠিক ও সুস্পষ্ট সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। অন্য রাষ্ট্রের এসব তথ্য ও সংবাদ আহরণের জন্য রাষ্ট্রদূতের কার্যালয়কে অনেক সময় গুপ্তচরের কাজও করতে হয়। যদিও আন্তর্জাতিক বিধি অনুসারে কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ কখনো গুপ্তচরের কাজ করতে পারেন না। কিন্তু দেখা যায়, কখনো কখনো বিদেশে অবস্থিত রাষ্ট্রদূতের কার্যালয়গুলো তাদের নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ আদায় ও সংরক্ষণের জন্য এরূপ গোপন গুপ্তচরবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে।
১৪. স্বীয় দেশকে বিশ্বে উপস্থাপন : কূটনীতিকের বিশেষ দায়িত্ব হলো তার নিজ দেশের নীতি ও রাজনৈতিক আদর্শ বিদেশে প্রচার করা এবং সে নীতি ও আদর্শের পক্ষে বিদেশে জনমত গঠন করা। তাছাড়া নিয়োগপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের জাতীয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও রাষ্ট্রদূতগণের স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যিক। রাষ্ট্রদূত তার ব্যক্তিগত আচার-আচরণ, চালচলন, কথাবার্তা, ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা, রুচি প্রভৃতি দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত দেশের সরকার ও উচ্চ পর্যায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করতে তৎপর থাকেন।
১৫. বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ করা : কূটনীতিক অনেক সময় নিয়োগপ্রাপ্ত দেশে নিজ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজ করে থাকেন। বহিঃবাণিজ্য বিষয়ক কর্ম সম্পাদনের জন্য বিদেশে বাণিজ্য দূতগণকে নিয়োগ দান করা হয়। যদি সব বাণিজ্য দূত অনুপস্থিত থাকেন অথবা অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে নিয়োগ না দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে কূটনীতিকই বাণিজ্য দূতের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।



আলোচ্য বিষয়

Diplomatic Immunities and Privileges

বিশ্বের অধিকাংশ জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকেই আন্তঃরাষ্ট্রীয় কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলেও তার কোন আইনগত স্বীকৃতি ছিল না। ফলে সকল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাসহ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ বিষয়ক জাতিসংঘ সনদের উদ্দেশ্য ও নীতিকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ এক সময়য় একটি সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক আইনগত কাঠামো (কনভেনশন) এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। যে কনভেনশনের মাধ্যমে কূটনৈতিক সংসর্গ, অধিকার ও দায়মুক্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাংবিধানিক ও সামাজিক ব্যবস্থা নির্বিশেষে জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটবে। তবে প্রদত্ত অধিকার ও দায়মুক্তি কোনভাবেই ব্যক্তি স্বার্থে নয় বরং কূটনৈতিক মিশনসমূহের কার্যক্রম পরিচালনায় প্রযোজ্য হবে।

কূটনৈতিক অধিকার, দায়মুক্তি ও সুযোগ সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে কোন জটিল প্রশ্নের উদ্ভব ঘটলে প্রচলিত প্রথাগত আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে সমাধানের সুযোগ রেখে ১৯৬১ সালের ১৮ এপ্রিল ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের কূটনৈতিক আদান-প্রদান ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রতিনিধি সম্মেলনে ভিয়েনার কূটনৈতিক সম্পর্কের কনভেনশন স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৫৪ সালের ২৪ এপ্রিল এ কনভেনশন কার্যকরী হয়। এই চুক্তির ৫৩টি ধারা রয়েছে। বিদেশে নিযুক্ত কূটনীতিবিদদের বেছে নেওয়া, গ্রহণ করা, স্তর বিন্যাস, বিশেষ অধিকার, দেশের অধিকার ও দায়িত্ব এতে নির্ধারিত হয়। এই ধারার মধ্যে প্রধানত রয়েছে-

- ✓ সংশ্লিষ্ট পক্ষের চুক্তি অনুযায়ী দেশগুলোর মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা এবং দূতাবাস স্থাপন করা।
- ✓ দূতাবাসের দায়িত্ব হলো সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করা, সে দেশ ও সে দেশের নাগরিকদের স্বার্থ সুরক্ষা করা, যে দেশে কূটনৈতিক নিযুক্ত করা হয় সে দেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা, যে দেশে নিযুক্ত করা হয় সে দেশের অবস্থা খতিয়ে দেখা, নিজ দেশের কাছে সরকারী রিপোর্ট দাখিল করা এবং নিজ দেশ ও গ্রহণকারী দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা ইত্যাদি।
- ✓ দূতাবাসে প্রধানত তিনটি পদ আছে, রাষ্ট্রদূত, মিনিস্টার এবং চার্জ দ্যা আফেয়ার্স। এ তিনটি পর্যায়ের কর্মকর্তাদের যে দেশে নিযুক্ত করা হয় সে দেশের অনুমোদন পেতে হয়।
- ✓ দূতাবাস ও দূতাবাসের কর্মকর্তাদের কূটনৈতিক অধিকার এবং নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। দূতাবাস ভবন এবং কূটনীতিবিদদের আক্রমণ করা যায় না। কূটনীতিবিদদের বাসস্থান আক্রমণ করা যায় না, তা সুরক্ষা করা হয়।

এ চুক্তি স্বাক্ষরের সাথে সাথে আরও দুটি প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছে। এতে দূতাবাসের বিশেষ অধিকার ও নিরাপত্তা এইভাবে নির্ধারিত হয়েছে যে, দূতাবাসের ভবন আক্রমণ করা যাবে না, দলিল পত্র আক্রমণ করা যাবে না, তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে অবাধ। দূতাবাসের কর্মকর্তাদের আচরণ ও ভ্রমণ অবাধ থাকবে, কর মওকুফ করা হবে, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় প্রতীক ব্যবহার করা ইত্যাদি। দূতাবাসের কর্মকর্তাদের বিশেষ অধিকার ও নিরাপত্তা প্রধানতঃ তাদের নিরাপত্তার বেঘাত করা যায় না, বাসস্থান এবং সম্পদ আক্রমণ করা যায় না। যে দেশে কূটনীতিবিদ নিযুক্ত করা হয়, সেদেশের ফৌজদারী মোকদ্দমা, দেওয়ানী মোকদ্দমা এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাপ্রহণ থেকে তাঁরা রেহাই পান। তাদের কর ও শুল্ক মওকুফ করা হয়।

কূটনীতিকদের বিশেষ অধিকার ও সুবিধাবলি : কূটনীতিক ও তার পরিবারের সদস্যরা স্বাগতিক দেশে Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961) এর আওতায় দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে কতিপয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হলো-

০১. **পররাষ্ট্রের আইন হতে মুক্তি :** কূটনীতিবিদগণ যে দেশে কাজ করেন সাধারণত সে রাষ্ট্রের দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের এখতিয়ার হতে তাকে মুক্তি দেয়া হয়। তারা সব সময় নিজ দেশের আইনের আওতাধীন তবে বিশেষ কোন অপরাধের সাথে জড়িত থাকলে তার নিজ দেশের অনুমতি সাপেক্ষে উক্ত দেশের আইনের অধিনে তার বিচারকার্য সম্পন্ন হতে পারে।
০২. **স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার :** একটি দেশের জাতীয় নিরাপত্তার কারণে যেসব এলাকায় প্রবেশ করা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ বা সরকারিভাবে নিয়ন্ত্রিত, সেসব এলাকায় সংশ্লিষ্ট প্রচলিত আইন ও নিয়মকানুন মোতাবেক গ্রাহক বা প্রাপক রাষ্ট্র তার ভূ-খণ্ডে মিশনের সদস্যবৃন্দের অবাধ চলাফেরা বা ভ্রমণের ব্যাপারে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।
০৩. **জবাবদিহিতা আওতামুক্ত :** কূটনীতিবিদরা যে রাষ্ট্রে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, সে রাষ্ট্রের প্রশাসনের কাছে তার কাজের জন্য কোন প্রকার জবাবদিহি করতে হয় না। কারণ তিনি জবাবদিহি করতে বাধ্য তার প্রেরক রাষ্ট্রের প্রশাসনের নিকট, অন্য রাষ্ট্রের নিকট নয়। এর ফলে সে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করতে পারে।
০৪. **ব্যবহৃত দ্রব্যাদি তল্লাশি থেকে মুক্তি প্রদান:** যে রাষ্ট্রে একজন কূটনীতিবিদ নিয়োগপ্রাপ্ত হন সে রাষ্ট্র তার নিজ দেশের আইন ও নিয়মানুসারে মিশনের সরকারি কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট তার আনীত বিভিন্ন দ্রব্যাদি, তার পারিবারিক সদস্যদের জন্য ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং তার সংস্থাপনের জন্য বিভিন্ন দ্রব্যাদি তল্লাশি হতে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে।
০৫. **ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ :** Diplomat Receiving State এ একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। এজন্য তিনি যে রাষ্ট্রে তার সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, সে রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল তার ব্যক্তিগত সকল প্রকার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা। এমনকি সরকার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাদেরকে পুলিশি সাহায্য দিতে বাধ্য থাকবেন।
০৬. **পতাকা ব্যবহারের অধিকার :** যেহেতু একজন Diplomat একটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত সেহেতু তিনি মিশন প্রধানের বাসস্থানসহ মিশনের প্রাঙ্গণে এবং মিশন প্রধানের ব্যবহৃত যানবাহনে তার নিজ দেশের পতাকা ব্যবহারের অধিকার সংরক্ষিত থাকবে।
০৭. **আক্রমণের আওতামুক্ত :** কূটনীতিককে বৈষম্যমূলক ভাবে কোন ধরনের আক্রমণ করা যাবে না। কূটনীতিবিদগণ নিযুক্ত দেশের সরকারের কাছ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা লাভ করবেন এবং অবাধ চলাফেরার ব্যাপারেও নিশ্চয়তা লাভ করবেন। সর্বোপরি তিনি সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অধীন হবেন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত হবেন।
০৮. **চাঁদা প্রদান থেকে মুক্তি :** Diplomat যে রাষ্ট্র কর্তব্যরত থাকবেন সে রাষ্ট্র Diplomat এর নিকট হতে সব ধরনের ব্যক্তিগত সেবা, যে কোন সরকারি সেবা এবং অন্যান্য সেবার জন্য চাঁদার বাধ্যবাধকতা হতে মুক্তি প্রদান করবে।
০৯. **যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা :** একজন কূটনীতিবিদের কাজ হলো তার প্রেরক রাষ্ট্রের সরকার বা প্রশাসনের সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা। তাই তাকে বিভিন্ন সময়ে পত্রাদি প্রেরণ করতে হয়। এতে প্রাপক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কোন অধিকার থাকে না। এছাড়াও প্রতীক চিহ্ন ও শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বেতারের মাধ্যমে নিজদেশের প্রেরিত খবরের গোপনীয়তার ব্যাপারেও গ্রাহক রাষ্ট্র কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না।
১০. **কর ও শুল্ক প্রদান হতে মুক্তি লাভ :** Diplomat-গণ যেসব দেশে দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হন তাদেরকে সেসব দেশের প্রত্যক্ষ কর ও শুল্ক প্রদানের বিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দিতে হবে। তবে দ্রব্যের সাথে সংযুক্ত সব ধরনের পরোক্ষ কর তাকে দ্রব্য ক্রয়ের সময় প্রদান করতে হবে।
১১. **কনজুলার, পরিবারের সদস্যদের দায়মুক্তি :** ১৯৬৩ সালের কনসুলার সম্পর্ক বিষয়ক ভিয়েনা কনভেনশনের ৫৩(২) ধারা অনুযায়ী কনসুলার অফিসারদের পরিবারের সদস্য অথবা তাঁর ব্যক্তিগত কর্মচারীরাও ভিয়েনা কনভেনশন অনুযায়ী কূটনৈতিক দায়মুক্তি ও সুযোগ সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

➤ **কূটনৈতিকদেরকে প্রদত্ত বিশেষ সুবিধা ও দায়মুক্তি প্রত্যাহার যোগ্য কিনা ?**

কূটনৈতিকদেরকে তাদের কর্মের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনা করে বিশেষ সুবিধা ও দায়মুক্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। কাজেই অযথা কোন রাষ্ট্র বিদেশী কূটনৈতিকদের প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ও দায়মুক্তি প্রত্যাহার করতে পারে না। তবে অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় কোন কূটনৈতিক যদি গ্রাহক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে তবে সে দেশের কাছে তা অগ্রহণযোগ্য হতে পারে। এরূপ আপত্তিজনক কার্যকলাপের জন্য গ্রাহক দেশের সরকার তাকে পারসোনা নন গ্রাটা বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ঘোষণা করতে পারে এবং তাকে নিজ দেশে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য তার সরকারকে কোন ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন হয় না। ভিয়েনা কনভেনশনের ৩২ অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রেরক রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে লিখিতভাবে তার প্রতিনিধিদের প্রাপ্য ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা ও দায়-মুক্তি শিথিল করতে পারে।

STUDENT



STUDY

Persona non grata and Protocol

Persona non grata

পার্সোনা নন গ্রাটা (ল্যাটিন: Persona non grata) শব্দের আক্ষরিক অর্থ অবাঞ্ছিত বা অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। কূটনীতিতে পার্সোনা নন গ্রাটা বলতে এমন বহির্দেশীয় ব্যক্তিকে বোঝায় যার নির্দিষ্ট কোন একটি রাষ্ট্রে অবস্থান ও প্রবেশ ঐ রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সংক্ষেপে পার্সোনা নন গ্রাটা বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি গ্রাহক রাষ্ট্র কর্তৃক অগ্রহণযোগ্য ও অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তি অবাঞ্ছিত বলে ঘোষিত হলেই ঐ দেশ থেকে "প্রত্যাহারযোগ্য" বলে বিবেচিত হবে।

Persona Non Grata এর ব্যবহার : ১৯৬১ সালের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক ভিয়েনা কনভেনশনের ৯ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, গ্রাহক রাষ্ট্র প্রেরক রাষ্ট্রকে যেকোন সময়ে এই মর্মে নোটিশ প্রদান করতে পারে যে, মিশন-প্রধান, কোন কূটনৈতিক কর্মচারী বা অন্য কাজে নিয়োজিত কর্মচারীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। এ একতরফা নোটিশ প্রদানের জন্য গ্রাহক রাষ্ট্রকে কোন কারণ দর্শাতে হবে না। গ্রাহক রাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডে পৌঁছাবার পূর্বে কোন ব্যক্তিকে পার্সোনা নন গ্রাটা ঘোষণা করা যাবে।

এসব ক্ষেত্রে প্রেরক রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রত্যাহার করবে অথবা উক্ত মিশনের সাথে তার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটাবে।

প্রটোকল

কূটনৈতিক রীতিপদ্ধতির (procedures) নিয়মকানুন (rules) বিশেষত যা সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিদের, অন্যান্যদের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্বীকৃত পদমর্যাদা অনুযায়ী সরকারি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে যা প্রয়োগ করা হয়। সরকারি ও প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডে এধরনের নিয়মকানুনের প্রয়োগ বেশি এবং একারণেই হয়তো রাষ্ট্রের রাষ্ট্রাচার প্রধানকে (Chief of Protocol)-কে আনুষ্ঠানিকতার গুরু (Master of Ceremonies) বলা হয়।

পারিভাষিক অর্থে প্রটোকল হলো পদস্থ কোন সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ও যথারীতি সত্যায়িত লেনদেন বা চুক্তি ইত্যাদি সংক্রান্ত মূল মন্তব্য বা কার্যবিবরণী। এই বিবরণী পরবর্তী যে কোন দলিলকে বৈধতা প্রদান করে। কূটনৈতিক ভাষায় প্রটোকল হলো সরকারি অনুষ্ঠানে এবং অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান কর্তৃক পালনীয় আনুষ্ঠানিক শিষ্টাচারবিধি।

দেশের অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান এবং কার্যক্রমেও প্রটোকল থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের রাজন্যবর্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে বিস্তারিত প্রটোকল অনুসরণ করতেন। কূটনৈতিক শিষ্টাচার ও আচরণবিধির ক্ষেত্রে প্রটোকল প্রণালী আধুনিক রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিকভাবে নির্ধারিত। কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক ভিয়েনা কনভেনশন (১৯৬১, যাতে বাংলাদেশও স্বাক্ষরকারী) দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের সফরের সময় অনুসরণীয় বিধিমালা ও আনুষ্ঠানিকতা নির্ধারণ করে দিয়েছে। অধিকন্তু, বাংলাদেশও কোনো বিদেশি রাষ্ট্র/সরকার প্রধানের সফরের সময় এবং কোনো বিদেশি দূতাবাস প্রধানের প্রথম বাংলাদেশে আগমনের সময় বিস্তারিত প্রটোকল ও আনুষ্ঠানিকতা পালন করে। এ ধরনের সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বিমানবন্দরে ভি.ভি.আই.পি/ ভি.আই.পি কক্ষের ব্যবহার এবং সকল কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তির পদমানক্রম অনুসরণ করে থাকে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ কূটনৈতিক মিশনসমূহের প্রধানদের, যেমন রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার ও বাংলাদেশে অবস্থানরত অন্যান্য দূতাবাস/ হাইকমিশন/ কনসুলেট, জাতিসংঘ ও বিশেষ ধরনের প্রতিষ্ঠানের কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের পারস্পরিক ভিত্তিতে বিশেষ কিছু কূটনৈতিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রটোকল বিভাগ বাংলাদেশ সরকারের প্রটোকল সংক্রান্ত বিষয়সমূহ তদারকি এবং সেগুলোর সমন্বয় সাধন করে।

STUDENT



STUDY

অর্থনৈতিক কূটনীতি

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কূটনীতির রয়েছে সুপ্রাচীন ইতিহাস। কূটনীতিই নির্ধারণ করে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জন সমাজের মধ্যকার পারস্পারিক সম্পর্ক। সুপ্রাচীন কাল থেকে প্রতিটি রাষ্ট্রই কোন না কোন ভাবে অন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত। এ সম্পর্ক স্থাপন ও রক্ষার ক্ষেত্রে কূটনীতিই পালন করে মূখ্য ভূমিকা। তাই বিশ্ব ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে কূটনীতিরও হয়ে থাকে পরিবর্তন ও পরিমার্জন। বিংশ শতাব্দির শুরু থেকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির পরিবর্তনে কূটনৈতিক কলাকৌশলও পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি দেশই তার দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কূটনীতির আশ্রয় নিচ্ছে।

যুগের পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে কূটনীতির ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে নতুন মাত্রা ও বিষয়। এর মধ্যে রয়েছে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, পরিবেশ, মানবাধিকার, দারিদ্র বিমোচন ইত্যাদি যা পররাষ্ট্রনীতির বহিরাঙ্গ থেকে এখন মূল ধারায় যুক্ত। সরকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতির যোগ সূত্রকে আরও সুসংহতভাবে স্থাপিত করেছে। মিশনসমূহ আজ অধিকতর গুরুত্বের সাথে অর্থনৈতিক কূটনীতি পরিচালনায় নিয়োজিত আছে। অর্থনৈতিক কূটনীতির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সরকারি পদক্ষেপগুলো হচ্ছে :

- রপ্তানি আয় বাড়ানো, বিদেশের বাজারে পণ্য প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হ্রাসের প্রচেষ্টা চালানো।
- বিদেশ থেকে স্বদেশে বৈধ উপায়ে অর্থ প্রেরণের জন্য উৎসাহদান ও বিশেষ ব্যবস্থা প্রচলন, হস্তিরাধ, বিদেশে বাংলাদেশিদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি।
- সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) বৃদ্ধি সাধনে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালানো, ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি ইত্যাদি।

কূটনীতি ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা ইস্যু নিয়ে বেশি নিবদ্ধ ছিল। সময়ের পরিবর্তনে এখন জোর দেয়া হয়েছে অর্থনৈতিক বিষয়াদির উপর। ঔপনিবেশিকতার অবসান, জোটনিরপেক্ষ নীতি, তৃতীয় বিশ্বের সংহতি আর উচ্চকণ্ঠে উচ্চারিত হয় না। এ সমস্ত প্রত্যয়ের স্থান দখল করেছে বিশ্বায়ন, অবাধ প্রতিযোগিতা, অর্থনৈতিক ব্লক ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অর্থনৈতিক স্বার্থবোধ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে (ইরাক) সামরিক হস্তক্ষেপ অর্থনৈতিক কূটনীতিরই নামান্তর। অন্য দিকে জাপান কর্তৃক চীনের অর্থনৈতিক সংযোগ অর্থনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াস বলে অভিহিত করা হয়। অন্যদিকে প্রযুক্তিতে উন্নত দেশ সমূহকে দেখা যায় অন্যের উপরে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ে ব্যস্ত থাকতে, অন্য কথায় অন্যের সম্পদের নাগাল পাবার প্রচেষ্টায় রত থাকতে, আর এ লক্ষ্যে অর্জনে অনুসৃত নীতিই হচ্ছে অর্থনৈতিক কূটনীতি।

সাধারণভাবে অর্থনৈতিক কূটনীতি বলতে আমরা বুঝি অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে প্রচলিত বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক পরিচালিত কলাকৌশলকে, অর্থাৎ যে কূটনীতির চূড়ান্ত ও চরম লক্ষ্য অর্থনৈতিক স্বার্থ হাসিল করা সেই কূটনীতিই হলো অর্থনৈতিক কূটনীতি। অর্থনৈতিক কূটনীতিতে বাণিজ্যিক দূতগণই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কূটনীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে।

নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব

আন্তর্জাতিক সমাজ ও রাজনীতি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এটি সময়ের সাথে সংগতি বিধান করে নিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনের এ ডেউ থেকে বিশ্ব অর্থনীতি ও কূটনীতিও দূরে থাকতে পারেনি। নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় কূটনীতির গতানুগতিক কৌশলসমূহ আশানুরূপ সাফল্য প্রদর্শনে ব্যর্থ হচ্ছে। তার স্থলে আসন করে নিয়েছে অর্থনৈতিক কূটনীতি। নয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব অপরিসীম, যা নিম্ন আলোচনা করা হলো:

বিশ্ব রাজনীতির নতুন গতিধারা : অর্থনীতি বিশ্ব ব্যবস্থার অন্যতম নিয়ামক শক্তি। নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় বিশ্ব রাজনীতিতে যে সব গতিশীলতার অভ্যুদয় ঘটে, তাতে অর্থনৈতিক শক্তির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। গতিশীল বিশ্ব ব্যবস্থায় নিজের আসন সুদৃঢ় রাখার জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রই অর্থনীতিকে কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারে উদ্যোগী হয়। এমতাবস্থায় বিশ্ব রাজনীতিতে অন্যান্য শক্তি অপেক্ষা অর্থনৈতিক কূটনীতিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার : অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক ও বহুমাত্রিক প্রসার নয়া বিশ্বব্যবস্থায় কূটনৈতিক অঙ্গনকেও বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছে। বলা হয়ে থাকে, অর্থনীতিই নিয়ন্ত্রণ করেছে আধুনিক রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতিকে। বহির্বিশ্বে নিযুক্ত প্রতিটি দেশের কূটনৈতিকদের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থনৈতিক স্বার্থোদ্যম। ফলে অর্থনৈতিক অর্জন করেছে আরো গুরুত্বপূর্ণ আসন।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক জোটের আত্মপ্রকাশ : নয়া আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মৈত্রীজোট। গ্যাট, আসিয়ান, ইইসি, জি-৮ ইত্যাদি ন্যায় বাণিজ্যিক জোটগুলো বিশ্বের অন্যতম নিয়ন্ত্রক। বিশ্ব বাণিজ্যের সিংহভাগই

নিয়ন্ত্রণ করে এসব জোট। কিন্তু সুবৃহৎ জোট বা অর্থনৈতিক শক্তি হওয়ায় এদের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেন কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞগণই। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জোটের সম্প্রসারণ বিশ্ব রাজনীতিতে অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব অনেকখানি বৃদ্ধি করেছে।

বহুমেরুকের্দিক বিশ্ব ব্যবস্থা : নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় স্নায়ুযুদ্ধের অবসান বিশ্ব রাজনীতি থেকে দ্বিমেরু প্রবণতার অবসান ঘটিয়েছে। ফলে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে উদ্ভব হয়েছে একাধিক শক্তির এবং প্রত্যেকেই তার স্বীয় প্রভাববলয় তৈরিতে তৎপর। আর এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতা ও পরামর্শই কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিশ্ব ব্যবস্থার এ নব রূপে অর্থনৈতিক কূটনীতি অর্জন করেছে গুরুত্বপূর্ণ আসন।

উন্নত তথ্য-প্রযুক্তি : বর্তমান উন্নত তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে গোটা বিশ্ব ব্যবস্থাই হয়েছে এক ক্ষুদ্র গ্রাম বিশেষ। তথ্য-প্রযুক্তির এই বৈপ্লবিক বিবর্তন অর্থনৈতিক অঙ্গনকেও দিয়েছে গতিশীলতা। এর ফলে বিশ্ব অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ-সংস্কৃতিও হয়েছে পরিবর্তিত ও উন্নত। তথ্য-প্রযুক্তির এই অভাবনীয় অগ্রগতি হতে আরো অধিক সুফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে বিশ্বের সকল শক্তিই রাজনৈতিক কূটনীতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক কূটনীতিকেও হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে।

নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: বিশ্ব রাজনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থনৈতিক অঙ্গনেও সাধিত হয়েছে সুবিশাল পরিবর্তন। মুক্তবাজার অর্থনীতির জয়জয়কার বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র প্রতিযোগিতামূলক এই বিশ্বে ব্যবস্থায় টিকে থাকতে হলে সর্বত্র প্রয়োজন সুচিন্তিত অর্থনৈতিক নীতিমালা ও যুগোপযুগী কৌশল। কূটনৈতিক অঙ্গনের বিশেষজ্ঞদের পক্ষেই কেবল এ ধরনের জটিল ও প্রতিযোগিতামূলক নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্ভব। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাই কূটনৈতিক অঙ্গন পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে অর্থনৈতিক কূটনীতিকেই গুরুত্ববহ করেছে।

মর্যাদার মানদণ্ড হিসাবে অর্থনীতি : অতীতে সামরিক শক্তিই নির্ধারণ করত কোনো রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মর্যাদার আসন। কিন্তু নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় এ মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে ব্যাপকভাবে। বর্তমানে সামরিক দিক থেকে দূর্বল হয়েও কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কথা কলা যেতে পারে প্রায় সামরিক শক্তিহীন জাপান বর্তমান বিশ্বে অন্যতম প্রভাবশালী রাষ্ট্র।

বহুজাতিক সংস্থার তৎপরতা সৃষ্টি : বর্তমান যুগে বহুজাতিক সংস্থা সরকারি সংগঠন বিদেশে নানা রকম অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত রয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কে বৃদ্ধি থাকায় এসব সংস্থার কাজ-কারবারও ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তাই বহুজাতিক সংস্থাসমূহ এবং বৈদেশিক দপ্তরসমূহ কূটনীতির আওতায় অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে গেছে।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসান: বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান গোটা বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থারই আমূল পরিবর্তনের সূচনা করে। স্নায়ুযুদ্ধকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সামরিক প্রভাববলয় সৃষ্টির যে সর্বগ্রাসী প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্ব ব্যবস্থায় তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সকল পরাশক্তি তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে অর্থনৈতিক স্বার্থোদ্ধারে সচেষ্ট হয়। ফলে অর্থনৈতিক কূটনীতিই তাদের কাছে মুখ্য হয়ে দেখা দেয়।

পারস্পারিক সাহায্য-সহযোগিতার প্রসার : নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় অনেক সম্পদশালী রাষ্ট্র উন্নয়নশীল বিকাশমান রাষ্ট্রসমূহকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করছে। এই বিদেশি সাহায্য কতখানি কার্যকর বা ফলপ্রসূ হচ্ছে, কূটনীতিককেও তাও খেয়াল রাখতে হচ্ছে। সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত কিনা এবং কী পরিমাণ ও কী জাতীয় সাহায্য দেয়া যেতে পারে, বর্তমান যুগে তাও কূটনীতির পর্যবেক্ষণের আওতাভুক্ত।



আলোচ্য বিষয়

Transshipment and Transit

Transshipment (ট্রান্সশিপমেন্ট) : ট্রান্সশিপমেন্ট হলো একটি দেশের পণ্য তাদের পরিবহনে ঐ দেশের সীমান্ত পর্যন্ত আসার পর সেসব সামগ্রী যে দেশের মধ্যদিয়ে নিয়ে নেওয়া হবে সে দেশের বাহনে তুলে গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া। আর ট্রানজিট হচ্ছে অন্য দেশের মালামাল তাদের নিজস্ব যানবাহনে আরেক দেশের মধ্যে দিয়ে গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া। যেমন : ভারতের মুম্বাই থেকে ১০ টন সোডা এ্যাশ যদি ভারতীয় ট্রাকে করে এসে বেনাপোল দিয়ে সেই ট্রাক ঢুকে আরিচাঘাট পার হয়ে কুমিল্লা দিয়ে আগরতলা যায় তবে তাকে বলে ট্রানজিট। আর ১০ টন মাল বেনাপোলের অপর পাড়ে হরিদাসপুর আসার পর বাংলাদেশের সোনার বাংলা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির একটি ট্রাকে চাপিয়ে তা কুমিল্লা সীমান্তে ভারতীয় বর্ডার বরাবর নামিয়ে দেয় তখন তাকে বলা হয় ঐ ১০ টন সোডা এ্যাশের ট্রান্সশিপমেন্ট।

Transit (ট্রানজিট) : ট্রানজিট হলো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যোগাযোগ ব্যবস্থা। কোন দেশ তার নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পরিবহনের সুবিধার জন্য চুক্তির মাধ্যমে অন্যদেশের ভূ-খণ্ড ব্যবহারের সুযোগ পেলে তাকে ট্রানজিট বলে। স্থলপথ, জলপথ কিংবা আকাশপথেও এই ট্রানজিট হতে পারে। বাণিজ্য সুবিধার জন্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার অনেক দেশে এ ব্যবস্থা চালু আছে। বাংলাদেশ ও ভারতের বাণিজ্য আলোচনায় ট্রানজিট বলতে ভারতীয় সরকারের স্থলবাহী পরিবহন মাধ্যম কর্তৃক বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের রাজ্যসমূহে বা একইভাবে বিপরীতক্রমে পণ্য চলাচলের অধিকারকে বুঝায়। আবার ট্রান্সশিপমেন্ট বলতে একই সুবিধা বাংলাদেশের মালিকানাধীন যান ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবহন বুঝায়।



আলোচ্য বিষয়

Environmental Issues, Challenges & Climate Change

জলবায়ু পরিবর্তন বলতে সাধারণত বুঝায় আবহাওয়ার দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিবর্তন যা প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে। বর্তমানে অবশ্য এই প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয় ভিন্ন কারণে। মানুষসৃষ্ট দূষণের কারণে গ্রীণহাউস প্রতিক্রিয়া হতে পারে এই আশংকা থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। মানুষের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের ফলেও জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটতে পারে। বন ধ্বংস ও মরুকরণ প্রক্রিয়ার ফলে ভূমিতে আলবেডোর পরিবর্তন (প্রতিফলনীয়তা) ভূ-পৃষ্ঠে কি পরিমাণ সৌর শক্তি শোষিত হচ্ছে তার উপর প্রভাব ও পরিবর্তিত করবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করার জন্য যে মডেলগুলো উদ্ভাবন করা হয়েছে সেগুলো জলবায়ুর গড় সম্পর্কে ধারণা দিতে অসমর্থ। কার্যত: আবহাওয়ার চরমভাবাপন্নতাই ক্ষতি ঘটাবে বেশি। এর ফলে শুরু হবে প্রচণ্ড খরা ও বড়, পরিণামে ঘটবে সম্পদ ও জীবন হানি। এখানে উল্লেখ যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু বিভিন্ন সময়ে বিরাজ করেছে। প্রথম শৃঙ্খলাবদ্ধ আবহাওয়াগত পর্যবেক্ষণ সংগৃহীত হয়েছে ২৫০ আগে থেকে। কার্বন ডাই অক্সাইডের নির্গমনের কারণে যে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তিত হতে পারে বা ভূ-মণ্ডলীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেতে পারে এ কথা প্রথম বলেছিলেন এক মার্কিন বিজ্ঞানী জে টিভাল ১৮৬৩ সালে অর্থাৎ ১৫০ বছর আগে। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন, যা ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনে স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপিত হয়, ১৯৯৪ সালের ২১ মার্চ কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করা হয়।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্যে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে অভিভূত হয়েছে। ২০০৮ সালে German Watch এর দেয়া রিপোর্টে বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সে যাইহোক, জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রথম দিকে একটি পরিবেশগত সমস্যা হিসেবে মনে করা হলেও, বর্তমানে এটিকে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট ধরা হয়। মনে করা হয়, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তাকেও হুমকির মুখে ফেলবে।

জলবায়ু পরিবর্তন ও জাতীয় নিরাপত্তা

পূর্বে শুধুমাত্র ভৌগলিক নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণকে জাতীয় নিরাপত্তা মনে করা হলেও, বর্তমানে জাতীয় নিরাপত্তার ধারণাটি আরো ব্যাপকতা লাভ করেছে। বর্তমানে যে কোন দেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ও নাগরিকদের নিরাপত্তাকেও জাতীয় নিরাপত্তার অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সেহেতু, জলবায়ু পরিবর্তনের যে ফলাফল তা ক্রমশ : বাংলাদেশের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তনকে জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি মনে করা হয় :

০১. উপকূলে বিপর্যয় : উষ্ণতার কারণে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে উপকূলীয় অঞ্চলে বিপর্যয় নেমে আসবে। সেহেতু, সেসব এলাকার মানুষ স্থানচ্যুত হলে, তাদের নতুনভাবে আবাসন তৈরি করা অত্যন্ত দুরূহ হবে। দুর্যোগ তাদেরকে জনবহুল এ দেশের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য করবে। এভাবে দেশের সার্বিক নিরাপত্তা বাধাগ্রস্ত হবে।
০২. জল নিরাপত্তা : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের প্রধান নিরাপত্তা হুমকি হবে পানির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করণ। পানির অপ্রতুলতা ও লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের একটা বৃহৎ অঞ্চলে পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। একদিকে যেমন ভারত থেকে প্রবাহিত নদীগুলোর প্রবাহ কমে যাবে, অন্যদিকে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে পানির লবনাক্ততা বৃদ্ধির ফলে বিশুদ্ধ পানির স্বল্পতা জীবনযাত্রা বাধাগ্রস্ত করে তুলবে। যা দেশের কৃষি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলবে ও জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি তৈরি করবে।
০৩. খাদ্য নিরাপত্তা : বর্তমান যুগে খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি অতি বিস্তৃত ধারণা। খাদ্যের স্বাভাবিক সরবরাহের পাশাপাশি, তা ক্রয় করার ক্ষমতা ও যথোপযুক্ত পুষ্টি নিশ্চিত করাও খাদ্য নিরাপত্তার অংশ। যাইহোক, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হবে, যা জাতীয় নিরাপত্তার হুমকি তৈরি করতে পারে।
০৪. জ্বালানি নিরাপত্তা : জ্বালানি নিরাপত্তা বর্তমান বিশ্বে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান শর্ত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিশ্ব জ্বালানি নিরাপত্তার যে হুমকি তৈরি হবে তার প্রভাব বাংলাদেশকেও বহন করতে হবে। যা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্যে একটি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।
০৫. স্বাস্থ্য নিরাপত্তা : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পরিবেশের যে বিপর্যয় তৈরি হবে তা দেশের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলতে পারে। নানা ধরনের রোগ-জীবানু বিস্তৃতি লাভ করবে যা জাতীয় নিরাপত্তায় হুমকি তৈরি করতে পারে।
০৬. সংঘর্ষ ও সংঘাত : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের যে স্থানান্তর ও পরিবেশ বিপর্যয় ঘটবে তা সংঘাত ও সংঘর্ষকে উসকিয়ে দিতে পারে। তাতে দেশের স্বাভাবিক স্থিতিশীলতা বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে। দীর্ঘ মেয়াদে দেশ দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে।
০৭. পরিবেশ দূষণ : জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়বে পরিবেশের উপর। বিশেষত: প্রাণিজগত ও গাছ-পালার উপর প্রভাব ফেলবে। যা বাংলাদেশের পরিবেশের কাঠামোকেই বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে। এভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের নানা প্রভাব বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে নিয়ে যেতে পারে এবং দীর্ঘ মেয়াদে দেশকে অস্থিতিশীল করার সম্ভাবনা অনেক বেশি।
০৮. প্রাকৃতিক বিপর্যয় : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্যে প্রচণ্ড হুমকি।

✚ উত্তরণের উপায়

জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পরিবেশগত বিপর্যয়রোধে বাংলাদেশ নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নিতে পারে :

০১. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জলবায়ু বিষয়ক আলোচনায় বাংলাদেশকে গ্রীণহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমানোর জন্যে জোরদার ভূমিকা রাখতে হবে।
০২. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন (adaptation) প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে National Adaptation Programme of Action (NAPA) গ্রহণ করেছে এবং ভবিষ্যতে এ প্রক্রিয়াকে আরো জোরদার করতে হবে।
০৩. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু তহবিল গঠনের জন্যে বাংলাদেশের যে দাবী তা আরো সোচ্চার হতে হবে।
০৪. দেশের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় যথোপযুক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের অনেক দেশই জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো কঠোর আকারে দেখা দিচ্ছে। যে কারণে বাংলাদেশকে এখনই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে।



আলোচ্য বিষয়

Global Warming

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বর্তমান বিশ্বে পরিবেশগত প্রধান সমস্যাসমূহের অন্যতম। এটি জলবায়ুগত এমন এক পরিবর্তন নিয়ে আসছে যা প্রক্রিয়াগতভাবে গ্রীন হাউস প্রভাবের সাথে তুলনীয়। সমস্যাটিতে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসার বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি এজন্য যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক গঠনটি একশ বছর পূর্বের অবস্থা থেকে ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানের প্রযুক্তিগত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে নিকট ভবিষ্যতে এই পরিবর্তিত অবস্থাকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

বৈশ্বিক উষ্ণতা

একশত বছর পূর্বের গড় তাপমাত্রার তুলনায় বর্তমান বিশ্বে গড় তাপমাত্রা প্রায় ০.৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জলবায়ুগত পরিবর্তন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ২১ শতকের সমাপ্তিকালের মধ্যে বিশ্ব তাপমাত্রায় আরও অতিরিক্ত ২.৫ থেকে ৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা যুক্ত হতে পারে। কালের আবর্তের সাথে সাথে পৃথিবী পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকেই বিশ্ব উষ্ণায়ন বলা হয়। বিশ্ব উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের পানির স্ফীতি, অত্যুচ্চ পর্বতের বরফশীর্ষ এবং মেরু অঞ্চলের হিমবাহের দ্রুত গঠনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতার ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

পৃথিবীর জলবায়ুর অবস্থা সবসময় এক থাকে না। কখনও জলবায়ুতে উষ্ণতার প্রভাবে বেশি থাকে, আবার কখনও হিমবাহের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। যেমন- বিশ লাখ বছর পূর্বে পৃথিবীর তাপমাত্রা অনেক বেশি ছিল। সে সময় থেকে পৃথিবী হিমযুগ-আন্তঃহিমযুগ এই চক্রের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে, প্লাইস্টোসিন যুগের এই একটি হিমযুগ থেকে আর একটি হিমযুগ চক্রের মধ্যে দোদুল্যমান। কারণ হল সূর্যকে ঘিরে পৃথিবীর কক্ষপথের ভিন্নতা এবং পৃথিবীর তির্যক হয়ে আবর্তনের সঙ্গে সূর্যের সম্পর্কের বিষয়টি হিমযুগ থেকে আন্তঃহিমযুগ অতিক্রম করে আরেকটি হিমযুগের সূত্রপাতের এই চক্রটির আবর্তন ঘটে প্রায় প্রতি ১ লাখ বছর পরে। হিমযুগে পৃথিবীর তাপমাত্রা পরবর্তী হিমযুগে অন্তর্বর্তী সময়ের তাপমাত্রার তুলনায় ৪° থেকে ৫° সেলসিয়াস কম ছিল। সর্বশেষ হিমযুগটির সমাপ্তি ঘটে প্রায় ১০ হাজার বছর পূর্বে এবং এর ফলে মহাদেশীয় হিমবাহের পশ্চাদপসারণ ঘটে। গত ১০ হাজার বছর সময়ে বিশ্বের তাপমাত্রা ২° সেলসিয়াস এর অধিক উঠানামা করেনি।

বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় বায়ুমণ্ডলের বিশেষভাবে নির্দিষ্ট গ্রীন হাউস গ্যাসসমূহের উপস্থিতির মাত্রার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিকে। বায়ুমণ্ডলীয় এই গ্যাসসমূহ হ্রস্বতরঙ্গের সৌররশ্মি পৃথিবীতে পৌছতে বাধার সৃষ্টি করে না, অথচ দীর্ঘতরঙ্গের অবলোহিত বিকিরণ পৃথিবী থেকে বহির্বিষ্মণ্ডলে যেতে বাধার সৃষ্টি করে, যার ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে উষ্ণ হয়ে ওঠে। বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্যাসগুলো হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন এবং বায়ুমণ্ডলের জলীয়বাষ্প। শিল্পায়ন, কৃষি সম্প্রসারণ, বিশেষত আর্দ্র ধান চাষ, স্বয়ংক্রিয় যানবাহনের সংখ্যাগত বৃদ্ধি, বনাঞ্চল উজাড় হওয়া এ সবগুলোই প্রথম চারটি গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধিতে তাৎপর্যময় ভূমিকা রাখে।



আলোচ্য বিষয়

Climate Adaptation

জলবায়ু অভিযোজন

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় প্রধান করণীয় জলবায়ুর অভিযোজন প্রক্রিয়া। বিশেষত ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের প্রধান করণীয় হচ্ছে-জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে সকল বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তা মোকাবিলার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা প্রণয়নের দিকে নজর দেয়া। IPCC-র চিহ্নিত তিন প্রকার অভিযোজন প্রক্রিয়া- Retreat, Accommodation এবং Protection-গুলো মনোযোগী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করতে হবে। কাঠামোগত পরিকল্পনার পাশাপাশি অবকাঠামোগত বিষয়াদি; যেমন- ব্যাপক ভিত্তিতে বনায়ন, জনসাধারণকে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য সহনশীল করে তোলা ইত্যাদি কর্মসূচি জলবায়ু অভিযোজনের উপায় নিয়ে ব্যাপক গবেষণা কার্যক্রম এর পরিধি বিস্তৃত করতে পারে। আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস সর্বোপরি জনসচেতনতা সৃষ্টি করলে অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং সম্ভাব্য ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস পাবে। জলবায়ু বিপন্নতা বিষয়টি উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করলে জলবায়ু অভিযোজন অধিকতর গ্রহণযোগ্য হবে।



আলোচ্য বিষয়

Climate Diplomacy

বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতির সম্মুখীন হওয়া অধিকাংশ রাষ্ট্রই অনুন্নত। পরিবেশ ঝুঁকি মোকাবেলা এবং প্রতিরোধের জন্য আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্যে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো উন্নত রাষ্ট্রগুলোর মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হচ্ছে। তাই এ ক্ষেত্রে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলো নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় জাতিসংঘসহ বিভিন্ন পরিবেশ ফোরাম এবং উন্নত রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্কোন্নয়নের যে কূটনীতিক তৎপরতা চালু করেছে তাই জলবায়ু কূটনীতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। জলবায়ু কূটনীতির মূল বিষয়বস্তু হল জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলোকে প্রতিরোধ করা এবং ক্ষতির সম্মুখীন রাষ্ট্রগুলোর অধিকার নিশ্চিত করা এবং দাবী আদায় করা।

বাংলাদেশের জলবায়ু কূটনীতির নানা দিক

ওজোন স্তর রক্ষার জন্য ১৯৮৫ সালে United Nations Environment Programme (UNEP) কর্তৃক আয়োজিত ভিয়েনা সম্মেলনে ‘ভিয়েনা কনভেনশন’ গৃহীত হয়। পরবর্তী ১৯৮৭ সালে কানাডার মন্ট্রিলে ৪৬ টি দেশের স্বাক্ষরে গৃহীত হয়- Montreal Protocol on Substances that deplete the Ozone layer। বাংলাদেশ এই প্রটোকল স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর মাঝে অন্যতম। বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট Vienna Convention for the Protection of the Ozone layer (1985) ও Montreal Protocol on substances that deplete the Ozone layer (1987) অনুমোদন করে। প্রটোকল অনুযায়ী বাংলাদেশ ৫নং আর্টিকেল-এর ১নং তালিকাভুক্ত দেশ।

প্রটোকলের শর্তানুযায়ী সিএফসি, হ্যালন ও কার্বন টেট্রোক্লোরাইড-এর ব্যবহার ১ জানুয়ারি, ২০১০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। এছাড়া মিথাইল ক্লোরোফর্ম ও মিথাইল ব্রোমাইডের ব্যবহার ১ জানুয়ারি, ২০১৫ সাল এবং হাইড্রোক্লোরোফ্লোরো কার্বনের ব্যবহার ১ জানুয়ারি, ২০৪০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার দেশে ব্যবহৃত ওজোন স্তর ক্ষয়কারী বস্তুসমূহ (Ozone Depleting Substances-ODS)-এর তালিকা প্রণয়ন করেছে। এই সকল বস্তুর ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার একটি পরিকল্পনা ১৯৯৪ সালে হাতে নেয়া হয়। এই পরিকল্পনায় সুপারিশ করা হয় ১. Aerosol প্রস্তুত কোম্পানিতে ODS ব্যবহার বন্ধ করা; ২. Ozone Cell গঠনের মাধ্যমে পরিকল্পনার বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধান করা; ৩. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ODS নির্গত প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে প্রশিক্ষণ দেয়া। ACI কোম্পানিতে CFC- 11 ও CFC-12 Aerosol উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হতো। মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর বহুপাক্ষিক সহযোগিতায় ACI কোম্পানিতে CFC-এর পরিবর্তে LPG ভিত্তিক Aerosol প্লান্ট স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে অনুদান পাওয়া যায় প্রায় দু’লাখ ৫০ হাজার ডলার। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দেশের প্রায় ৬৮ ভাগ ওজোন স্তর ক্ষয়কারী বস্তুর ব্যবহার হ্রাস পাবে। ৩২ ভাগ ওজোন স্তর ক্ষয়কারী বস্তুর ব্যবহার হ্রাসের জন্য সরকার Montreal Protocol Multilateral Fund-এর সহায়তা Refrigeration Sector Multilateral Fund-এর নির্বাহী কমিটির ২৯তম সভায় উক্ত RMP সহ চারটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়।

বাংলাদেশ সরকার ওজোন স্তর রক্ষায় পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি Ozone Cell গঠন করে। এই কাজে আনুমানিক ব্যয় ধরা হয় প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার ডলার। এই Ozone Cell পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সহায়তার নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে-

১. ODS (Ozone Depleting Substances)-এর জাতীয় কারিগরি কমিটির সচিবালয় হিসেবে কাজ করা;
২. ODS-এর পর্যায়ক্রমিক হ্রাসের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহের সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও সমন্বয় সাধন;
৩. বাংলাদেশে ODS সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহ মনিটর করা;
৪. মন্ট্রিল প্রটোকল অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত বস্তুসমূহের আমদানি, উৎপাদন ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্যাদি সচিবালয় প্রেরণ করা;

৫. ODS-এর বিকল্প বস্তু, বিকল্প প্রযুক্তি, রিসাইক্লিং ইত্যাদির উপর তথ্য বৃদ্ধি, তথ্য বিনিময়, সেমিনার ও ওয়ার্কশপের আয়োজন করা ও
৬. দেশের কান্ট্রি প্রোগ্রামের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অগ্রগতির রিপোর্ট সচিবালয়ে প্রেরণ প্রভৃতি।

১৯৯২ সালের ৩ থেকে ৪ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে যে বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন হয় তা রিও সম্মেলন নামে পরিচিত। বাংলাদেশ ওই সম্মেলনে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ও Convention on Biological Diversity চুক্তি দুটিতে স্বাক্ষর করে। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ স্বাক্ষরিত চুক্তিদ্বয় অনুমোদন করে। স্বাক্ষরিত চুক্তিদ্বয়ের মধ্যে বাংলাদেশ UNFCCC কার্যকর করতে অধিক কাজ করেছে। তবে রিও সম্মেলনের Intergovernmental Negotiating Committee-তে সরকারি পর্যায়ে পর্যায়ে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ছিল নাজুক। ফলে পরিবেশ কূটনীতিতে নেতৃত্ব প্রদানের একটি বিশাল সুযোগ বাংলাদেশের হাতছাড়া হয়ে যায়। সে তুলনায় বাংলাদেশি এনজিও কিংবা গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্রিয় অবদান প্রশংসনীয়। Bangladesh Center for Advance Studies দক্ষিণ এশিয়ার Climate Action Network-এর সচিবালয় নির্বাচিত হয়।

সরকারিভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশকে নিয়মিতভাবে তার কার্যক্রমের প্রতিবেদন UNFCCC-তে প্রেরণ করতে হয়। আবহাওয়া পরিবর্তন সংক্রান্ত নানা গবেষণা ও কার্যক্রম সরকারের পাশাপাশি বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্স স্টাডিজ, বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট ফর ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ও প্রকৌশল পরিচালনায় এডিবি বিআইডিএসকে অর্থ সাহায্য দিয়েছে।

US Climate Change study Programme-এর অর্থায়নে ও BCAS-এর নেতৃত্বে বিআইডিএস, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদ, আবহাওয়া পরিবর্তনের উপর একটি কান্ট্রি স্টাডি প্রোগ্রাম সম্পন্ন করে। এছাড়া গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন বন্ধের লক্ষ্যে পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং BCAS-এর নেতৃত্বে বিআইডিএস, বুয়েট ও বিইউপি একত্রে Asia Least Cost Greenhouse Gas Abatement Strategy (ALGAS)-এর উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করে। এই কাজে অর্থ সাহায্য করে এডিবি, ইউএনডিপি ও Global Environment Facility (GEF)। রিও সম্মেলনে Agenda 21 কার্যকর করতে বাংলাদেশ National Environment Management Action Plan (NEMAP) গ্রহণ করেছে। NEMAP বাস্তবায়নে ADB ও UNDP বাংলাদেশকে অর্থ সাহায্য করেছে।

১৯৯৭ সালের ১১ ডিসেম্বর জাপানের প্রাচীন নগরী কিয়োটোতে জাতিসংঘের উদ্যোগে বিশ্বের তাপমাত্রা রোধসংক্রান্ত এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৬০ টি দেশ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। ব্যাপক মতপার্থক্যের পর সম্মেলনের শেষ দিন উষ্ণতা রোধে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিয়োটো চুক্তিতে বলা হয়েছিল, ইউরোপীয় ইউনিয়ন কার্বন-ডাই অক্সাইড নিঃসরণে মাত্রা ১৯৯০ সালের তুলনায় ৮ ভাগ, যুক্তরাষ্ট্র ৭ ভাগ ও জাপান ৬ ভাগ হ্রাস করবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ অন্যান্য গ্রীণহাউজ গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা ১৫ ভাগ হ্রাসের প্রস্তাব করলে যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান এত অসম্মতি জানায়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশ হিসেবে মালদ্বীপ গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের মাত্রা দাবী করেছিল শতকরা ২০ ভাগ। বাংলাদেশ মালদ্বীপের প্রস্তাব সমর্থন করেছিল। কিয়োটো সম্মেলনে স্বাক্ষরিত চুক্তির ৩.১৪ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের ন্যায় দরিদ্র দেশগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রভৃতির নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল। তবে পরিবেশ উন্নয়নে এই সব নিশ্চয়তা পালনে ধনী দেশগুলো যে খুব একটি সচেষ্ট নয় তা তাদের কাজের মন্থরতা দেখলে সহজেই পরিলক্ষিত হয়।

১২ নভেম্বর, (২০০০) নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে ১৮০ টি দেশ দু'সপ্তাহের জন্য মিলিত হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধকল্পে অনুষ্ঠিত ওই সম্মেলনে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকল-এর বাস্তবায়নে ধনী দেশসমূহের অবহেলা তীব্রভাবে সমালোচিত হয়। বাংলাদেশ এই সম্মেলনে UNFCCC-এর ৪.৮ ও ৪.৯ ও কিয়োটো সম্মেলনে স্বাক্ষরিত সনদের ৩.১৪ ধারা বাস্তবায়নের দাবী জানায়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দাবী ওঠে- "There should be a fund for vulnerability assessment, disaster preparedness and adaptation." বাংলাদেশ প্রস্তাব করে আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে যেসব সমস্যা সৃষ্টি তা মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ধনী দেশগুলোর ঋণ, অনুদান, প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রভৃতির সমন্বিত উদ্যোগ নেয়া উচিত।

বাংলাদেশের ন্যায় এশিয়ার এ অঞ্চলের দেশসমূহের জন্য সম্মেলনে ক্ষমতার মনোনিবেশ, দারিদ্র বিমোচন, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জীববৈচিত্র্য রক্ষাসহ কতিপয় মৌলিক প্রয়োজন আলোচনা করে তার জন্য করণীয় কাজের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। জোহান্সবার্গ ঘোষণায় বাংলাদেশকে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণে বলা হয়-

- ক. ২০১৫ সালের মধ্যে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
খ. ২০২০ সালের মধ্যে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর জ্বালানি ব্যবহার বন্ধ করা। পরিবেশ রক্ষায় টেকসই জ্বালানি ব্যবহার করা;
গ. গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং সরকারের স্বচ্ছতা সকল পর্যায়ে নিশ্চিত করা;

- ঘ. বাংলাদেশে প্রায় ২৮ হাজার শিশু প্রতিবছর সহজে নিবারণযোগ্য রোগে মৃত্যুবরণ করে। ২০১৫ সালের মধ্যে এ সংখ্যা অর্ধেক নামিয়ে আনা;
- ঙ. এশিয়ায় প্রায় ৫০ মিলিয়ন মানুষ আর্সেনিক দূষিত পানি পান করে। বাংলাদেশে এ সংখ্যা ব্যাপক। ২০২০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা অর্ধেক নামিয়ে আনা;
- চ. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণে ভারসাম্য আনান;
- ছ. পরিবেশ সচেতন ব্যবসায়িক প্রকল্প গড়ে তোলা;
- জ. ২০১৫ সালের মধ্যে মা ও শিশু মৃত্যুর হার অর্ধেক নামিয়ে আনা।

সত্তর এর দশকের শুরু থেকেই পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের বিষয়টি বিশ্বব্যাপী গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়ে আসছে। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত স্টকহোম কনফারেন্স (UN conference on the Human Environment) এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিবেশ বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (Environmental Agencies) গঠন ও জাতীয় পরিবেশ কর্মপরিকল্পনা/ নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৮৮ সালে বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে গঠিত "Intergovernmental Panel on Climate Change" (IPCC) এর সুপারিশমালা গ্রহণ-আন্তর্জাতিক উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

- **কিয়োটো প্রটোকল :** পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আরেকটি পদক্ষেপ হচ্ছে United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত কিয়োটো প্রটোকলের নেগোসিয়েশন। ক্ষতিকর কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও গ্রীনহাউজ গ্যাস উদগীরণ কমানো লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত কিয়োটো প্রটোকলের ২০১৬ পর্যন্ত বিশ্বের ১৯২ টি (ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ) দেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত (ratified) হয়েছে। বর্তমানে গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ বৃদ্ধির ফলে Kyoto Protocol-এর স্বাক্ষরকারী উন্নত দেশসমূহের বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে উন্নয়নশীল দেশসমূহের অবদান মাত্র ২৭ ভাগ। ইতোমধ্যেই রাশিয়া, জাপান ও কানাডা Kyoto Protocol থেকে বের হয়ে আসার ঘোষণা দেয়। সে প্রেক্ষাপটে Kyoto Protocol-এর বৈশ্বিক গ্রীন হাউজ গ্যাস নিঃসরণে অবদান মাত্র ১৫ ভাগে নেমে আসবে।
- **কানকুন জলবায়ু সম্মেলনে বা COP- 16 :** ডিসেম্বর ২০১০ এ কানকুনে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব রোধে কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে অনুষ্ঠিত COP- 16 এ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :
 - অভিযোজন (Adaptation) কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের জন্য Adaptation Committee গঠন;
 - যে সকল দেশে ১০ টিরও কম Clean Development Mechanism (CDM) প্রকল্প আছে এমন দেশগুলোকে সহায়তা এবং ঋণ প্রদান;
 - Green Climate Fund প্রতিষ্ঠা;
 - উন্নত দেশ কর্তৃক দীর্ঘমেয়াদে ২০২০ সাল হতে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সরবরাহ করা;
 - ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি Transitional Committee দ্বারা Green Climate Fund এর গঠন চূড়ান্ত করা;
 - উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত ২৪ সদস্যের একটি বোর্ড দ্বারা উক্ত ফাণ্ড পরিচালিত হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;
 - একটি প্রযুক্তি নির্বাহী কমিটি ও একটি জলবায়ু প্রযুক্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে Technology Mechanism অর্থাৎ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- **ডারবান জলবায়ু সম্মেলন বা COP- 17 :** ২৮ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর, ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে COP- 17 (Conference of the Parties- 17) বা ডারবান জলবায়ু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জলবায়ু সম্মেলনে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অর্জন রয়েছে। তার কয়েকটি নিম্নরূপ :
 - **Green Climate Fund-এর কার্যক্রম শুরু :** Finance বিষয়ক নেগোসিয়েশন উন্নত বিশ্ব অভিযোজন এবং প্রশমন হ্রাস কার্যক্রমে স্বল্প মেয়াদে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে প্রতিবছর ১০ বিলিয়ন করে ২০১০-১২ সময়ে ৩ বছরে ৩০ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;
 - Technology Development and Transfer-এর আওতায় Technology Mechanism, Technology Executive Committee এবং Climate Technology Center and Network প্রতিষ্ঠা।
- **দোহা জলবায়ু সম্মেলন বা COP- 18 :** ২০১২ সালে কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত UNFCCC এর Conference of the Parties 18 (COP- 18) বা দোহা জলবায়ু সম্মেলনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক নেগোসিয়েশনে বিগত তিন বছরের অর্জনকে একীভূত করে সম্ভাবনার এক নতুন দ্বার উন্মোচন করে। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত অনেকগুলো সিদ্ধান্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল—
 - বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত IPCC এর Fourth Assessment Report (AR4)-এর আলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বৈশ্বিক গ্রীনহাউজ গ্যাস নির্গমনের চূড়ান্ত সীমা (global peaking) নির্ধারণ পূর্বক COP-ভুক্ত সদস্য দেশসমূহ গ্রীনহাউজ গ্যাস

নির্গমণের পরিমাণ ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিবে যাতে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা প্রাক-শিল্পায়ন যুগের গড় তাপমাত্রার উপরে ২০° সেলসিয়াস এর নীচে ধরে রাখা যায়। তবে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য সর্বোচ্চ নির্গমনের সময়সীমা আরো দীর্ঘায়িত হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

- **উন্নত দেশসমূহে প্রশমন (Mitigation) :** উন্নত দেশসমূহে তাদের অভ্যন্তরীণ জাতীয় পরিস্থিতির আলোকে প্রশমন বা কার্বন নিঃসরণ হ্রাস (Mitigation)-এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের জন্য SBSTA এর অধীনে ২০১৩ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে একটি কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- **ক্ষয়-ক্ষতি (Loss and Damage) :** জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বিপন্ন উন্নয়নশীল দেশসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় Loss and Damage বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক মেকানিজমসহ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- **প্রযুক্তি (Technology) :** COP- 19 এ TEC এবং Climate Technology Center and Network (CTCN) এর মধ্যে সম্পর্কের উন্নতিসাধনের বিষয়ে সম্মত হয়।
- COP- 18 সম্মেলনে Kyoto Protocol-এর মেয়াদ ২০১২ থেকে বারিয়ে ২০২০ সালে উন্নতি করা হয়।

- **ওয়ারশ জলবায়ু সম্মেলন বা COP- 19 :** ১১-২৩ নভেম্বর, ২০১৩ সালে পোল্যান্ডের ওয়ারশতে অনুষ্ঠিত UNFCCC এর Conference of the Parties- 19 এ delegate-দের মধ্যে একটি global climate agreement এর বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ-

- **ওয়ারশ আন্তর্জাতিক ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ক ব্যবস্থা (Warsaw International Mechanism for Loss and Damage) :** জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিশেষ করে extreme events এবং slow onset events এর কারণে উন্নয়নশীল নাজুক দেশসমূহে যে ক্ষয়-ক্ষতি (Loss and Damage) হয় তা সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে পুষিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা (International Mechanism) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া পরবর্তী ২২তম জলবায়ু সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পর্যালোচনাপূর্বক নতুন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- **অর্থায়ন (Finance) :** Long-term finance বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। উন্নত দেশসমূহকে ২০১৪ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রদেয় Climate finance আনুপাতিক হারে বৃদ্ধির (scaling up) জন্য হালনাগাদ কৌশল ও পদক্ষেপ (updated strategies and approaches) সমন্বয়ে দ্বিবার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে অনুরোধ করা হয়েছে।
- **২০১৫ এর চুক্তি পালন বাধ্যবাধকতা (Legally Binding Agreement 2015) :** কনভেনশনের আওতায় সকল সদস্য দেশের জন্য নতুন একটি প্রটোকল বা একটি লিগ্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট বা একটি legal force সহ agreed outcome ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিতব্য COP- 21 তে adoption এর জন্য যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল তার কার্যকর অগ্রগতি অর্জনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০২০ সাল হতে Legally Binding Agreement 2015 কার্যকর করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
- **প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর (Technology Development and Transfer) :** CTCN-এর modalities এবং procedures এবং CTCN-এর উপদেষ্টা বোর্ড এর rules of procedures গ্রহণ করা হয়। CTCN কার্যকর করার জন্য প্রতিটি দেশে জাতীয় স্তরে National Designated Entities (NDE) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বাংলাদেশে পরিবেশ অধিদপ্তরকে NDE হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

- **প্যারিস জলবায়ু সম্মেলন :** ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর ২০১৫ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে COP- 21 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ :

- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ২১০০ সালের মধ্যে দুই ডিগ্রী সেলসিয়াসের কম রাখার লক্ষ্য।
- গাছ, মাটি ও সমুদ্র প্রাকৃতিকভাবে যতটা শোষণ করতে পারে, ২০৫০ সাল থেকে ২১০০ সালের মধ্যে কৃত্রিমভাবে গ্রীণহাউজ গ্যাসের নিঃসরণ সেই পরিমাণে নামিয়ে আনা।
- প্রতি পাঁচ বছর অন্তর গ্রীণহাউজ গ্যাস নিঃসরণ রোধে প্রত্যেকটি দেশের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে গরিব দেশগুলোকে ধনী দেশগুলো ‘জলবায়ু তহবিল’ দিয়ে সাহায্য করা।
- **মারাক্কেশ জলবায়ু সম্মেলন :** ০৭ নভেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বর, ২০১৬ সালে মরক্কোর মারাক্কেশ COP- 22 সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে গৃহীত উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ-
 - জলবায়ু প্রযুক্তি খাতে আটটি শিল্প উন্নত দেশ থেকে ২ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার দেয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে।
 - জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বিশ্বব্যাপক কৃষি খাতে তাদের বিনিয়োগ দ্বিগুণ করার ঘোষণা দিয়েছে।
 - ২০২০ সালের আগে প্যারিস চুক্তির কার্যকর বাস্তবায়ন শুরু হচ্ছে না।
 - আগামী দুই বছর ১১ টি বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করে রাষ্ট্রগুলো যেসব বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছাবে, সেবিষয়গুলো ধরেই চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হবে।
 - সবুজ জলবায়ু তহবিলে রাষ্ট্রগুলোকে ২০২০ সালের মধ্যে ১ হাজার কোটি মার্কিন ডলার দেওয়ার আহবান জানানো হয়েছে।
- **বন সম্মেলন :** ২০১৭ সালের ০৬-১৭ নভেম্বর জার্মানির সাবেক রাজধানী বন-এ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ২৩তম সম্মেলন (COP-23) অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে প্যারিস সম্মেলনে গৃহীত বিষয়সমূহের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- **কোটোউইস সম্মেলন :** ২০১৮ সালের ৩-১৪ ডিসেম্বর পোল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ শহর কোটোউইস -এ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ২৪তম সম্মেলন (COP-24) অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে জলবায়ু ভারসাম্যতায় সারা বিশ্বের উষ্ণতাকে ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে নামানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাপক ১০ হাজার কোটি ডলারের একটি তহবিল প্রদানের আশ্বাস দেন।
- **মাদ্রিদ সম্মেলন :** ২০১৯ সালের ০২-১৩ ডিসেম্বর স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ২৫তম সম্মেলন (COP-25) অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান
 - বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ২১০০ সালের মধ্যে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম রাখার লক্ষ্য।
 - গাছ, মাটি ও সমুদ্র প্রাকৃতিকভাবে যতটা শোষণ করতে পারে, ২০৫০ সাল থেকে ২১০০ সালের মধ্যে কৃত্রিমভাবে গ্রিন হাউজ গ্যাসের নিঃসরণ সেই পর্যায়ে নামিয়ে আনা।
 - জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে গরিব দেশগুলোকে ধনী দেশগুলোর জলবায়ু তহবিল দিয়ে সাহায্য করা।
- **গ্লাসগো সম্মেলন :** ২০২০ সালের ০৯-২০ নভেম্বর যুক্তরাজ্যের স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো-তে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ২৬তম সম্মেলন (COP-26) অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা ভাইরাসের কারণে এ সম্মেলন ২০২১ সাল পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। পরিবর্তিত সময় অনুযায়ী ২০২১ সালের ০১-১২ নভেম্বর যুক্তরাজ্যের স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো-তে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ২৬তম সম্মেলন (COP-26) অনুষ্ঠিত হবে।

একুশ শতকে বিশ্বে পরিবেশগত সমস্যা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে উন্নয়নশীল বিশ্ব ক্ষতিগ্রস্ত হবে সবচেয়ে বেশি। উন্নত দেশগুলোর আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী হওয়ায় ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিবেশগত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারলেও উন্নয়নশীল দেশগুলো এ সমস্যা পুরোপুরিভাবে কাটিয়ে উঠতে পারলে না। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্তর্গত। বাংলাদেশ আগামী দিনগুলোতে বড় ধরনের পরিবেশগত সমস্যার মুখোমুখি হবে। এ কারণেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে পরিবেশগত সমস্যাটাকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। সুষ্ঠু পরিবেশ কূটনীতি বহিঃবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তিই শুধু বাড়াবে না, বরং বাংলাদেশের ভূমিকা উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য একটি মডেল হতে পারে।

বাংলাদেশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। একুশ শতকে বাংলাদেশকে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলার প্রয়োজনীয় কূটনীতিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু ঝুঁকির অন্যতম প্রধান দেশ বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু কূটনীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক কূটনীতির পাশাপাশি দক্ষতা এবং যোগ্যতার সাথে জলবায়ু কূটনীতি অব্যাহত রাখতে না পারলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে।